প্রথম প্রকাশ

দোল পূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রকাশক

দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ, ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদ

গণেশ বসু

মুদ্রক

নির্মল পাল, নির্মল মুদ্রণ, ৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য—দুই টাকা

সুরঙ্গমা-কে

ইচ্ছা করে যদি বা তোর বহতা কালো জলে
অলক্তক প্রবাল হ'তে দ্বীপের লীলাছলে।
এবং যদি আমার দিকে বাড়িয়ে দিস্ হাত।
কি দেব তোকে, আমার ঘরে গহীন কালো রাত।

একদা কোন্ শিশুর ভোরে আকাশ ছিল বড়ো।
প্রেমের ভীরু কথার মত মেঘেরা থরোথরো।
চেতনা কত নিকট ছিল, চেতনা সে তো ঘর।
শরীরে ছিল সুঠাম স্মৃতি তূণীরে ছিল শর।
এবং তাই নদীর জলে সেদিন তোকে স্নেহে—
টেনেছি কাছে, মুগ্ধপট এঁকেছি তোর দেহে।

আজকে ঘরে অন্ধকার বিষাদ রতিলীন।
এখানে রাত সরীসৃপ, লখিন্দর দিন।
তবুও তুই এলি যখন স্মৃতির মহাঋণে
অন্ধকারে যে ফুল ফোটে যে ফুল তৃণে, তৃণে
সঙ্গিনীর সঙ্গ দেয়, দিলাম তোকে—স্মৃতি।
খোঁপায় তুই রাখিস তাকে—আমার পরিচিতি।

আসিস্ রোজ অন্ধকারে তবু সুরঙ্গমা,
সে ফুল তোর খোঁপায় দেখে খুঁজবো আমি ক্ষমা

বেলা শেষ হ'লে

বেঁচে আছো—এই প্রশ্নে সকলেই সম্প্রতি বিমূঢ়,
কাঁচা বয়সের চোখে যৌবনের শিশির ভাদুড়ি।
সেতো এক উপাখ্যান সূর্য-ছোঁয়া আকাশের ঘুড়ি
অথবা আকাশটাকে চুমু-খাওয়া পাহাড়ের চুড়ো।

কিন্তু বেলা শেষ হ'লে যে-সময় কানের ওপরে
বরফের রঙ লাগে, সুকোমল মসৃণ চিবুকে
পীচের রাস্তার মত ভাঙাচোরা অজস্র গহ্বরে
হারানোর জল জমে, কি নিয়ে থাকবে বল সুখে!

কোনদিন সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার ঘরের শরীরে
রেডিওতে বেজেছিল সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠস্বর।
তোমার নির্জন সত্তা জাহাজের মত ধীরে ধীরে
ওইপারে গিয়েছিল কেঁপেছিল হৃদয়-মর্মর।
কিংবা কোন রাত্রিবেলা বিষ্ণু দে'র কবিতার আলো
তোমাকে দিয়েছে দৃষ্টি কিংবা ধ্রুপদের অন্তরূপ
সুধীন্দ্রনাথের কাব্য—আয়না দিয়ে আত্মার স্বরূপ,
আত্মীয় জলের ছবি ভোলেনাকো একটি মরালও।

অনুভব অ-নশ্বর, হারিয়ে যাও নেই কোন মানা,
সহজেই জানা যাবে তোমাকে ও তোমার ঠিকানা।

সাপ খেলানোর বাঁশি

জড়িয়ে নে রে, নদী, আমায় ভাসিয়ে নে তোর জলে,
ভালবাসার অন্তনাম নিবিড় যন্ত্রণা।
ছেলেবেলার সাপুড়ে তার স্মৃতির ছায়াতলে,
সামনে দোলে ফুলের মতন অজগরের ফণা।

ঘৃণাতে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, ওদিকে তাকাবো না,
সময় নামক ঘোড়ার পিঠে এখন আমি সওয়ার।
আকাশ মানে সাতটি রঙের চপল আনাগোনা
অথচ আমার দুচোখ জুড়ে রাতের অন্ধকার।

কখনও যদি ফোটাই ফুল, কখনও ভালবাসি,
আমায় মনে রাখিস, নদী, আমায় কাছে ডাকিস্।
বাজিয়ে দিস্ ছেলেবেলার সাপ খেলানোর বাঁশি
প্রবাহে তোর লক্ষ ফণা ঢেউয়ে তীব্র শিস্।

জড়িয়ে নে রে, নদী, আমায় ফিরিয়ে দে সেই ভেলা,
সাপ খেলানোর বাঁশি বাজা, ফিরুক সকালবেলা।

দেবব্রত বিশ্বাসের গান

রবীন্দ্রনাথের গান, দেবব্রত বিশ্বাসের স্বর,
একদা কি জানি কোন সন্ধ্যাবেলা কোন পুণ্যফলে—
ধ্রুপদী সম্বন্ধে বাঁধা—অনুভবে সমস্ত অম্বর
সকল দুঃখের দীপ জ্বেলেছিল মায়ামন্ত্রবলে।

আবহকালের দ্যুতি—যত তারা তোমার আকাশে
প্রাণভরি প্রকাশিত, আর কারো বাণী কোনখানে
শুনতে চাইনি আমি, বনফুল সন্ধ্যার বাতাসে—
অভিন্ন আমার সত্তা উঠেছিল সুরের সোপানে।

তোমার পূজার ছলে এতদিন ভুলেছি তোমাকে,
রবীন্দ্রনাথের কাছে এ আমার মূঢ় অপরাধ।
কিন্তু সে গ্লানির ঘর ভেসে গেল সমুদ্রের ডাকে,
সমস্ত দুয়ার ভেঙে কেউ দিল ঝড়ের সংবাদ।

সামনে অজস্র ফুল—সম্মোহিত ফুলের উদ্যান,
সমস্ত ছাপিয়ে বাজে দেবব্রত বিশ্বাসের গান।

স্রোতের মুখে

নদীর জলে নৌকা তোর কপালে টীপ,
অন্ধকার ভয় করিনা কক্ষনো।
গা ছমছম প্রেতের শরীর—শালবনও
বিপদকালে হয়তো হবে প্রবাল দ্বীপ।

চিতার চোখ রাত্রিবেলা হীরক হয়,
আলোর চোখে নামতে থাকে গভীর ঘুম।
চেতনা তার প্রাঙ্গনের নীল কুসুম
ঝরিয়ে বলে, আমি তো তার সঙ্গী নয়।

নিকটতর তবুও তার অশ্বক্ষুর,
কান্না থাক, বাঁচতে চায় তবুও কেউ।
আশ্বাসের ঝিলিকে কাঁপে জলের ঢেউ,
নৃত্য থামে, রাতের পায়ে চুপ ঘুঙুর।

বিশ্বাসের রৌদ্র—মুখে হাসির রঙ,
স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিই সব স্মৃতি।
বাঁচতে গিয়ে মরতে চাই, আজ বরং
মৃত্যু হোক ফুল ফোটানোর শেষ রীতি।

এ সহরে পা দিয়েই

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজোর দিনগুলোর উদ্দেশ্যে

মদের গেলাস থেকে মুখ তুলে তাকালো নগরী,
লাস্যে আলোকের ছটা, কণ্ঠে অন্তহীন তরলতা।
তপশ্চারী অন্ধকার যেন তাকে নিশীথে অপ্সরী
আজ পথভ্রষ্ট করবে, দীর্ণ করবে ধ্যানের স্তব্ধতা।

মনে হ'ল এ বাংলায় কোনদিনও বিস্মৃত অতীতে
রবীন্দ্রনাথ ব'লে কোন মানুষের ছায়াও পড়েনি।
সহরের উচ্চকিত মাইকের ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে
অন্ততঃ যে গান বাজছে তাতে তাঁকে চিনতে পারিনি

মুঞ্জরিত শাখে যেন বিকৃতির কীটদষ্ট ফুল,
শিল্পের ভ্রমরগুলো অন্বেষণে বিষণ্ণ বিক্ষত।
আজকে সহর যেন ধর্মের পবিত্র পরচুল
স্বেচ্ছায় পরেছে তাই মনেপ্রাণে সে যেন বিব্রত।

এ সহরে পা দিয়েই শুনলাম আজ উৎসব,
বেইমান বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ—বিগতবৈভব।

স্পর্শ, বর্ণ, রূপ, গন্ধের ফুল

তোমরা আমার অনেক অনেক অনেক
দূরেতে দাঁড়িয়ে।
তোমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি না যে।
ঘাসের আঙুলে শিশিরের অঙ্গুরী
বড় ম্লান আজ, বাতাসে সারং বাজে।
বড় নির্জন এখানের মায়াপুরী।
তোমার দুবাহু অন্ততঃ দাও বাড়িয়ে।

ভীষণ অচেনা সব পরিচিত মুখ,
বিশ্বাস করো এখানের কোন দৃশ্য—
আমাকে দেয় না এক লহমারও সুখ,
আমার বাগানে গুল্মের আজ নিঃস্ব।

তোমরা আমার অনেক অনেক অনেক
দূরেতে দাঁড়িয়ে।
এখানে আসে না স্মৃতির ক্ষুরের শব্দ,
বাতাসে দোলে না আপনতমার চুল,
নীল সমুদ্রে আশ্রয়-মাস্তুল,
তাও হারিয়েছি, আমি যে বিপ্রলব্ধ।

ফিরিয়ে দাও না স্পর্শ, বর্ণ, রূপ, গন্ধের ফুল,
তোমার দুবাহু অন্ততঃ দাও বাড়িয়ে।

ছায়ার সংযোগ

ঐশ্বর্যে আপ্লুত হয়ে ক্ষণিকের নশ্বর সম্ভোগ,
শেষতম আকর্ষণে কাছে টানি। গভীর নদীর
অবগাহনের মধ্যে খুঁজে নিই স্বচ্ছ আরশির
স্থির প্রতিবিম্ব আর সে আমার ছায়ার সংযোগ।

তুমি কোনদিন কোন পাহাড়ী যুবাকে
অনাদৃত কুসুমের মুঞ্জরিত তরুণ-মর্যাদা
দিতে পারোনিকো, তুমি যার জন্য আপন ইচ্ছাকে
প্রশ্রয়ে পারগ নও,—সংস্কারের কি অলঙ্ঘ্য বাধা।

অথচ আমিও এক পরিবেশ সঞ্জাত আকাশ,
ঐশ্বর্য ও নশ্বরতা অভিন্ন জেনেও ভালবাসি।
কারণ নৈঃশব্দ্যে আমি শুনতে পাই যে মোহন বাঁশি,
তা' তোমার অধিগম্যে চিরদিন অলীক প্রয়াস।

সেজন্য যা তাৎক্ষণিক আমি তার ঠিক অন্তরালে—
অতিরিক্ত কিছু পাই যার স্মৃতি পলাশের ডালে।

দুটি কবিতা

বন্যা

ভেসে গেল বন্যা। **উপকূল, উপকূল, উপকূলের কান্না আমার।** আমর্ষ মাল্লার মুখ।

এখনও সেই সুদূর হতে তীব্র হ্রেষা শুনতে পাই। সন্ধ্যার প্রতানে আলোকস্তম্ভের ঢেউগুলি। **উপকূল, উপকূল, উপকূলের কান্না আমার।** সাতরাত্রি, সাত দিন মাছগুলি অন্বেষণে ঘুমালো না। আহার্যের কণাগুলি রয়ে গেল বঁড়শীর মুখে।

ভেসে গেছে বন্যা। এরপর থেকে ছিন্ন পালের টুকরোগুলি ভেসে উঠবে মরা মাছ হয়ে। ভয় দেখাবে সমস্ত মাছকে। ভগ্ন পাটাতনগুলি এক একটি তরণীর মত। নৌকাডুবি হবে বারবার।

ভেসে গেছে বন্যা। বহু দূরে। দৃশ্যের ওপারে। ফিরে আসবে না। **উপকূল, উপকূল, উপকূলের কান্না আমার।**

এখনও সেই তীব্র হ্রেষা শুনতে পাই। যাত্রীদের চোখে ঘুম। আমর্ষ মাল্লার মুখ। **উপকূল, উপকূল, উপকূলের কান্না আমার।**

চাঁদ, সূর্য, তারা, চন্দ্রমল্লিকা

মদের পিপেটা উলটিয়ে দিও না। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা গন্ধের প্লাবন নেমে আসবে। মনে পড়ে যাবে ঘৃণা, অসূয়া, বিকৃতি এদের বিকলাংগ শরীরগুলো।

গতকাল যখন দিগন্তের নহবৎখানায় সন্ধ্যার সানাই শোনা গেছল, তখনই আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম চাঁদ, সূর্য, তারা এদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলী হওয়া প্রয়োজন। আর এখন আরো স্পষ্ট বুঝতে পারছি এখনই ভাববার সময়, এবারের শীতের মরশুমে ক্রিষ্টিনকীলারের মত যে সমস্ত চন্দ্রমল্লিকা ফুটবে তাদের শব্দ আর রঙের নন্দনকাননে নিয়ে গেলে উর্বশী, মেনকাদের সংগে তুলনা করা যাবে কিনা।

দুটি কবিতা

আলো নিভে গেলে

আলো নিভে গেলে পাতার আড়ালে তার মুখ……। সাতটা ঘোড়ার ছমছমে ক্ষুরের শব্দ এগিয়ে আসতে থাকবে। নীচু স্বরে কারো কথা শুনতে পাওয়া যাবে। শিরশির করে উঠবে নিস্তব্ধতার সমস্ত শরীর। একটা সাপ শরীরের ওপর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু ছোবল দেবেনা। একটা বাদুড় আপ্রাণ চেষ্টা করবে আকাশটাকে ঢেকে রাখার। দু'একটা মথ রেশম শরীরে নিয়ে উড়ে যাবে। বনবিড়ালগুলো খস্‌খস্‌ করে পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে। আলো নিভে গেলে পাতার আড়ালে তার মুখ চাঁদের মত কিংবা অন্ধকারের মত স্পষ্টতম হয়ে উঠবে। আলো নিভে গেলে পাতার আড়ালে তার মুখ দেখতে পাওয়া যাবে।

স্মৃতি

রক্ত ক্ষরণের ক্রমে ক্রমে রক্তটা শুকিয়ে জমাট হয়ে গেল। আহত লোকটা তার নাম দিল স্মৃতি। তারপর সারাক্ষণ ধরে ঐ স্মৃতির দিকে গভীর অভিনিবেশে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। ওর রক্তের সংগে ওর কি নিবিড় সম্পর্ক। আমি দেখলুম সারাক্ষণ স্মৃতির দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে লোকটাকে কেমন পাথরের মত দেখাচ্ছে। লোকটা যেন রক্তেরই মত জমাট হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হল ওই আহত লোকটার নামও স্মৃতি।

চিরব্যথার নাটে

মূর্ছাহত ফুল্লকুসুমরাজি,
প্ল্যাটফরমে হাজার লোকের মেলা।
ঘুম ভাঙানোর প্রস্তাবে গররাজী,
কি হবে তবে ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা।

রেলগাড়ীটা যদিইবা পথ ভুলে
চাঁদপুকুরের সোপান ছুঁয়ে যায়।
তবে কি জল উঠবে হঠাৎ দুলে,
পায়ের চিহ্ন বাজবে সোপানটায়।

ও ফুল যদি বিকিকিনির হাটে,
জুয়োর ঝোঁকে ঘাতক করে ক্ষয়।
অপমান কি কাঁপবে বিশ্বময়,
বাজবে বাঁশি চিরব্যথার নাটে।

মৃত্যু এলেও

অস্থিরতায় ডোবার আগে প্রেমের শেষ বিত্তে
দেখবে কেউ প্রতিবেশের মুগ্ধ মোহন দৃশ্য।
লোভে আতুর কৃপাণখানা দীপ্তিবিহীন নিঃস্ব।
বয়স দ্রুত পৌঁছে যাবে পরিণামের তীর্থে।

দেয়াল জুড়ে ঝরবে বালি, ছবিগুলোর চোখের কোণ,
লম্পটতার ধুলোর ছোপে মলিনতায় স্বেচ্ছালীন।
আলোর নীচে পতংগদের জন্ম এবং মৃত্যুদিন,
রক্তে গড়া সৌধ তবু এখনও প্রায় সাতযোজন।

অস্থিরতায় ডোবার আগে প্রেমের নীল বক্ষোবাস;
দেখবে কেউ সারা শরীর জলের সাদা আয়নাটায়।
জংঘা থেকে স্তনবৃন্তে অপরিমেয় ফুলের রাশ।

মৃত্যু এলেও অটুট ঘর, শার্সীদেহেই বৃষ্টি যায়।

আমার মুখের সরলতা

অবাক হয়ে মুখের পানে তাকিয়ে যারা দেখলো,
ঘষা কাঁচের মতন তাদের চোখ।
তাদের কাছে সিঁড়ি-ঘোরানো পাপপুণ্যের শ্লোক—
নেইকো মানে নেইকো।
আমার মুখের সরলতা তাদের কাছে কি আশ্চর্য ঠেকলো।
পরিবৃত নির্জনতা গাছগাছালির আত্মীয়তার বন্ধন,
ঘাটের রানায় ভীষণ মিশুক শৈবাল।
ভাবলো তারা আমার বুঝি তিন পেরিয়ে চার কাল।
প্রোথিত আছে উথালপাথাল জলে স্নানের দৃশ্য।
বুঝলো নাকো সংজ্ঞা দিলে এই তো অভিনন্দন।
ভাবলো এবার বাণিজ্যান্তে ফিরেছি আমি নিঃস্ব।
ঘরের পাশে গুলঞ্চরা ক্রমেই বাড়বাড়ন্ত,
বাতাসে দোলে কাঁঠালিচাঁপার অমূর্ত এক গন্ধ।
বাস্তুসাপের অবস্থিতি তেমনি লক্ষ্মীমন্ত,
প্রতিবেশের অনুরোধও তেমনি সনির্বন্ধ।
তারা তখন মনেপ্রাণে নিষ্প্রয়োজন করুণ পোড়ো জমি,
বুদ্ধি নামক সাপটাও যে জীবন্মৃত ছাড়ে না স্মৃতি-খোলস।
হৃৎপিণ্ড যাদুঘরের অচল অটল পাথরে-গড়া মমি,
পুকুরঘাটে আসে না তারা ভরেও নাকো পায়রা-ডাকা কলস।
অবাক হয়ে তারা আমার চাইলো মুখের পানে,
অপরিচয়ের বিস্ময় বা অর্থটা তার, তারও চেয়ে বড়ো।
আমি যেন আনমানুষটা হঠাৎ ভুলে এসেছি এইখানে,
পায়ের নিচে পতুলকা তেমনি ব্যস্ত ফুল-ফোটানোর গানে,
আমিই সেই, আমিই সেই—আমার কণ্ঠ আকুল থরোথরো,
কাচের চোখে তারা বললো,—না তুমি নও, তুমি তো ভিনদেশী।

রাজা, আমার রাজা

দেবকুমার বসু-কে

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় .....
পদধ্বনি মিলিয়ে গেল

কোথায়, কোথায়, কোথায়
সেই চাঁদোয়া,
সারেংগীর স্বরতরংগ,
মীড়, মূর্চ্ছনা,
শেষ বিন্দু মদের সেই গন্ধ

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত .....
পদধ্বনি দূরতর হল

রাজা, চোখের জলে তোমাব সিংহাসন ঝাপসা হয়ে আসে
রাজা, অন্ধকারের হাতে চাবিটা রেখে দিয়ে মাইফেল ছেড়ে
তুমি কোথায় গেলে

এক, দুই, তিন, চাব, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় ·
পদধ্বনি হাবিয়ে গেল
বাজা, রাজা, রাজা ·· ··
আমাব রাজা··· ··

ক্ষণউপস্থিতি

নিরুদ্দেশে যাবার আগে, নিরুদ্দেশে চলে যাবার
আগে।
এই দীঘি মাঠ তাকিয়ে দেখব আবার
ভীষণ অনুরাগে।

ঘরের কোণে পুষ্ট বিড়াল, খাবার ঠোঁটে বিষ,
শংকা তাকে হিংস্র হয়ে দেখায় বড়ো ভয়।
কার্পেটের মতন আমি ছড়িয়ে দেব নিজেকে ঘরময়।
সমস্ত ভয় আমার প্রতি জানাবে কুর্নিশ।

নিরুদ্দেশে যাবার আগে, নিরুদ্দেশে চলে যাবার আগে,
নেশায় যেমন হাওয়ায় ওড়ে ভালবাসার রঙে রাঙানো রুমাল,
আমার ক্ষণউপস্থিতি উড়িয়ে দেব স্মৃতির পুষ্পরাগে।

কি-জানি যদি না-হয় শেষ নিরুদ্দেশের কাল।

লখিন্দর

অতর্কিতে সংগোপনে রমণীয় নৈঃশব্দ্যের দ্বারে,
যাবতীয় দৃশ্যাবলী বন্দিনীর মহিমায় লীন।
আর কোন যাদুকর তার হাতে বৈশাখ, আশ্বিন,
স্নেহ, মোহ, প্রেম এরা নির্বিবাদী তার স্বেচ্ছাচারে।

রমণীয় নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে মেঘের পাহাড়,
অজস্র নদীর আত্মা চলমান সাগর-স্বপন।
নিঃশ্বাসে মন্ত্রিত স্তনে শিশুদের পবিত্র ক্রন্দন,
জানুর জন্মের উৎসে ছায়াবৃত কামুক কুঠার।

দৃশ্যত থাকে না কিছু বৃষ্টিধারা অপস্রিয়মান,
ইষ্টিসান ছেড়ে যাওয়া ট্রেন তবু ফের ফিরে আসে।
অস্থায়ীতে ফিরে আসে সম-আকর্ষিত সব গান।

মৃত্যু সে কি লখিন্দর বেহুলার কান্নার মান্দাসে?

তৃষ্ণা, আমার তরী

ছোট্ট আমার তরী।
আরোহী তা'তে বাইশটি অপ্সরী।
উড়িয়ে দিয়ে পীনোদ্ধত পাল,
জানিয়ে দিল যাত্রার প্রাক্কাল।
ছোট্ট আমার তরী।
আরোহী তা'তে বাইশটি অপ্সরী।
তরতরিয়ে চল্ল ছুঁটে স্রোতে,
যেন বা ঠিক একটি পদ্মকুঁড়ি,
হিংসুটে সেই চাঁদের দেশের বুড়ি
দেখছে তাকে আকাশ-জানালা হতে।
ছোট্ট আমার তরী,
আরোহী তাতে বাইশটি অপ্সরী।
চতুর্দিকে থৈ থৈ থৈ জল,
ক্ষিপ্র দাঁড়ের শব্দ ছলাৎছল্,
জেগে উঠবে সুপ্ত অজগর,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়বে ক্রুদ্ধ শিসেব স্বর
ছোট্ট আমার তরী,
আরোহী তা'তে বাইশ যাদুকরী।
আমি তাদের খেলার পুত্তলিকা।
তরীটা ঠিক আমারই পিপাসার
দৃশ্য ছবি এবং পালে-আমারই অহমিকা,
মন্ত্রবলে ছুটছে চারিধার,
হাওয়ার টানে ছিঁড়ছে দড়াদড়ি।

তৃষ্ণা, আমার তরী,
ছুটছে আর হাসছে তা'তে
বাইশটি অপ্সরী।

দুটি কবিতা

আসঞ্জন

প্রসারিত দুইটি বাহু,
অনেক দূরে তার
সুদূরগামী মাস্তুলে যে অপার কেশভার—
সেখানে আমার নিরবধি কালের পরমায়ু।

বাজুবন্ধে শব্দ হয় না, ঢেউয়ের কণ্ঠে বাজে,
হাজার স্বরের ঐক্যবিলীন সুর।
অস্তগামী মেঘের মত সে আজ অনেক দূর।

এখানে বয় হাল্কা হাওয়া এবং দশদিকে
আমার মত অনেকগুলি দুঃখাহিত মন—
হানাবাড়ীর ছবির সংগে মেলায় পৃথিবীকে,
মেলায় দুঃখঅনুভবের অন্ধ আসঞ্জন।

বৃষ্টি

সিক্ত কেশে তার মোহন গন্ধের উন্মাদনা।
কুসুম-কলসের স্পন্দন।
চলতে গেলে যেন সে আর মানবে না বন্ধন,
হঠাৎ জানিনাকো আজকে কেন সে যে অন্যমনা

রাত্রি চোখে তার আকাশ মোহলীন,
স্তব্ধতায় তার নিঃস্বন।
কেউ কি এসেছিল এখানে একদিন,
ছায়ায় ছিল অভিনন্দন।

যাত্রা অবসান

আকাশে কোন পদধ্বনি, সমুদ্রে কার দূরপাল্লার গান,
ভাবতে ভাবতে যাত্রা অবসান।

কলসে কাঁপা ঠাণ্ডা জলের মতন,
উত্তাপহীন ছায়ারা চলমান।
ছেলেবেলার জাপানী লণ্ঠন—
এসব ভাবতে যাত্রা অবসান।

মনের মধ্যে এখন একটা ধনুক,
তূণীরময় ভীষণ ব্যাকুল তীর।
তবু না ভাঙে দেহটা আরশীর।
সেখানে তবু দুলছে কাদের মুখ।
সুপ্রাচীন স্বপ্নবিধুর কোমল কোন সুখ।

অতুলনীয় লক্ষ্যবিহীন নিয়ত চলিফিরি
শশব্যস্তে ডিঙিয়ে যাই হাজার রকম সিঁড়ি।
জ্বলছে কই চতুর্দিকে গানের মত শ্রী।
কোথায় সেই সিংহাসন রত্নে মহীয়ান?

ভাবতে গিয়ে যাত্রা অবসান।

সময়যন্ত্রণার পাকে

সম্রাট সেন-কে

তোমার জাহাজ সমুদ্রটার যখন মধ্যিখানে,
আমার তখন বন্দরের কাল।
তুমি যখন চৈত্রে ছোটো সর্বনাশের টানে
আমি তখন লাল পলাশের ডাল।
কিন্তু তোমায় ফিরতে হল, ফিরতে হল, ফিরতে—
উপকূলের দুচোখে ছিল মায়া।
এবং সেই মোহিনী যাদু পারোনি তুমি ছিঁড়তে,
ভালবাসলে আমার চোখ, আমার মনের ছায়া।
এবং আমি জানতাম যে যন্ত্রণার হাতে
একদা তুমি রেখেছ হাত, আজও সে হাত বাঁধা।
জানি তোমার ঘুম আসেনা একলা বিজন রাতে।
ইদানীং যে আমার স্বরও যন্ত্রণাতে সাধা।
দ্রোণের তূণীর তোমার কাছে, সফল মৃগয়া যে,
আমারও তূণে রয়েছে সেই তীর।
এবং তোমার, আমার বুকে সে যন্ত্রণাই বাজে,
শিল্পে আমরা অর্জ্জুনের লক্ষ্যে আছি স্থির।
বয়স নিয়ে মিথ্যে যাচাই, হৃদয় অনেক বড়ো,
এবং শিল্প —তার কাছে আজ চেতনা-কংকন
আমরা যখন রেখেছি বাঁধা, দিতেই হবে পণ।
আমার জাহাজ তোমার পণ্যে এখন পূর্ণ করো।
যন্ত্রণার একটি বাহু তোমার সারাক্ষণ,
এবং অন্য বাহুর কাছে আমার সমর্পণ।
আমরা দুজন দোসর হয়ে আলাপে থরোথরো,
দুঃখ থাক্, বেদনা থাক্, তবুও গান ধরো।

গীর্জের চুড়ো

পৃথিবী নক্ষত্রের দূরত্বে স্থাপিত হয়েছে। এবং আমরা তার দিকে পিছন ফিরে এখন উগ্র অন্ধকারকে আত্মনিবেদন করছি। পায়ের নীচে দোমড়ানো ফুলগুলি পড়ে আছে। সময়ের পাশা খেলায় কেউ কেউ ব্যস্ত রয়েছে। গেলাসে রয়েছে পচাই। সমুদ্রের সাদা ফেনায় উপছে পড়তে চাইছে গেলাসটা। চোখগুলো সব চুনীর মত হয়ে গেছে। কেউ আমরা নাচছি না অথচ যে যেখানে পা ফেলতে চাইছি, ঠিক সেখানে পা ফেলতে পারছি না। আর, একজন যে পাত্রগুলো ভরে দিচ্ছে, সে আমাদের আংটির হীরেগুলো তার চোখের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে। সে কিন্তু ঠিকমত, ইচ্ছেমত অনায়াসে পা ফেলে চলে বেড়াচ্ছে। আমাদের মধ্যে শুধু একজন নিজের জন্যে কোন গেলাস সামনে রাখেনি। সে আমাদের গেলাস ভর্তি করে দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দিকে সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। কেন জানিনা, মনে হচ্ছে সামনে একটা গীর্জের চুড়ো আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি।

মাতাল

ইচ্ছাগুলি শেলফে রাখা বই-এর মত দামী,
অন্তপ্রভুর আজ্ঞা-অধীন, কষ্টে ছিলাম আমি।
হঠাৎ বিধুর সন্ধ্যাবেলায় হাজার তুরংগম
হৃদয় জুঁড়ে বাধিয়ে দিল দারুন বিভ্রম।

এখন লোকে মাতাল বলে, এখন টলে পা,
এখন নাকি নেশার ঘোরে অনেক কথাই বলি।
তখন নাকি ভিক্ষা করি রমণীদের কৃপা,
গাইতে গেলে ছিন্ন হয় তখন গানেব কলি।

তখন শাসন ভয় করি না, তুচ্ছ করি রাজা,
শব্দে সুরের নিমগ্নতা তখন মনে পড়ে।
গোলাম আলীর কণ্ঠে যেমন হৃদয কাঁপে ঝড়ে।
গাহনে যার অপাব সুখ, নেশাতো তার প্রজা।

ধৃত হলেই আবার তো সেই ক্রীতদাসেব সাজা।

এই ঘর

বদ্ধ করপুটে ছায়ার তনুহীন নিঃশ্বাস।
শ্রবনে দূরগত নীলাভ ধনুকের টংকার।
যদি বা কোনদিন কখনো গান বাজে চারিধার,
যাদের মনে হবে বারোটি পাখী ওড়ে বারোমাস,
দরোজা খুলে ত্যাখ, অদূরে কম্পিত বেশবাস।

যে ঘরে একা আছ সমুখে চিত্রের বিস্ময়,
নিয়ত আলো জ্ব'লে ক্ষণিক ফুৎকারে নিভে যায়।
তখন চিত্রের প্রযত মুখগুলি বাঙ্ময়,
আর যে কর্ত্রীর আমরা ক্রীতদাস স্বেচ্ছায়,
অমোঘ নির্দেশ বাহিত বায়ুস্রোতে জেগে রয়।

হাজার পাহাড়ের অন্ধ ভাষাহীন অবরোধ,
তুহাত বাড়ালেই শীতল কার যেন স্পর্শ।
এবং পাটাতনে ক্ষিপ্ত বাতাসের প্রতিশোধ,
এ কোন কারাগারে কাটাতে হবে বহু বর্ষ।

অথচ এই হাতে এখনও বিধৃত ফুলদল,
এখনও মনে পড়ে খাঁচায় পাখী ছিল একরাশ।
পাপড়ি ঝরে যায় এবং ঢেকে যায় ভূমিতল।

দ্বিধায় কাঁপে মন, যদি বা খুলে দেখি অর্গল,
উজানে বহুদূরে কখন ভেসে গেছে মান্দাস।
কাঁপে না সেথা কারো বাতাসে থরোথরো বেশবাস।

বদ্ধ করপুটে ছায়ার তনুহীন নিঃশ্বাস।

ভালবাসিনা

মুখ ফিরিয়ে নিলেই সে তো ঘৃণা,
চোখের জলে ভাসলে সে যে দুঃখ।
কেই বা বলে শিশুর তার স্বরে,
ভালবাসিনা। ভালবাসিনা। ভালবাসিনা।

বৃদ্ধা মায়ের শয্যাগত দেহ,
পুষ্পবিহীন মাধবীলতার মুখ,
নিজের রক্তে পলাশগুলি হেয়।
কেই বা বলে শিশুর তারস্বরে,
ভালবাসিনা। ভালবাসিনা। ভালবাসিনা।

ভালবাসিনা। ভালবাসিনা। ভালবাসিনা।
সবাই বলে, কিন্তু শিশুর তারস্বরে নয়।
কারণ দুঃখ বৃষ্টি জলে সমর্পিত হয়,
এবং সে যে নম্রকণ্ঠে সপ্ত সাগর লীনা।
ভালবাসিনা। ভালবাসিনা। ভালবাসিনা।
সবাই বলে, কিন্তু শিশুব তাবস্ববে নয়।

উত্তরণ

নিম্নস্বরে কারা এখন কাছাকাছি দেয় যে ডাক,
স্বপ্নে ভিজে গেছে অন্ধকার।
বারংবার তবু বারংবার
খাড়াই নীলপথে এগিয়ে চলে এক পাখীর ঝাঁক।

শূন্য কামরায় অন্ধ ভিখিরীর যাচনা কাঁদে,
বধির নীরবতা বলে না তাকে, নেই এখানে কেউ
এখনো প্রস্তরে সে সব রমণীরা নতুন ছাঁদে।
কবরী রচনায় দৃশ্যে তোলে কত উথাল ঢেউ।

নিম্নস্বরে কারা এখন কাছাকাছি কথামুখর,
শবের যাত্রার অন্তে কারা যেন দুঃখময়।
বাতাসে কুঁড়ি আর লক্ষ কুসুমের যুগ্মস্বর,
খাড়াই নীলপথে তবুও আরোহীরা পায় না ভয়।

স্বপ্নে ভিজে একা ভীষণ নির্জন অন্ধকার,
কণ্ঠে গান বাজে নীরব কোন এক শুদ্ধতায়।
বারংবার শুধু বারংবার
নিম্নস্বরে কারা হঠাৎ কোথা যেন ডাকে আমায়।

মহান মৌনতার দিকে

দেখো, ঠিক ভোর হ'লে আমি ফের আন্তরিক হবো।
দেখো, আমি খুঁজে নেবো সেই সাদা রৌদ্রের কুটির ;
সেই নীল জানলাগুলো ; সেই মুখ······সেই কোমলতা।
দোহাই তোমার, তুমি এখন আর ভয় দেখিয়োনা।

সমস্ত সহর জ্বলে দাউ দাউ বেলেল্লা চিৎকারে।
গ্লানি-পাপ হন্যে হয়ে চারপাশে আর্তনাদ করে।
গা'টা ছমছম করে। অবিকল শৈশবে যেমন
মায়ের বুকের কাছে মুখ রেখে দারুণ সন্ত্রাসে
স্মৃতির বিজন গ্রামে শেয়ালের রহস্যের ডাক।

অথচ এ অন্ধকারে আমি যদি নক্ষত্রের মত
পথের আঁচলটার শেষ কোথা দেখতে পেতাম,
তবে তো যেখানে সেই নদী মরা সাপের মতন,
স্বইচ্ছায় শুয়ে আছে, তার গায়ে রাত্রির প্রতিভা,
তৃণের মুকুটে যেন ধৃত আছে বিস্মিত শিশির ;
সেখানে যেতাম সেই শব্দহীন মৃত্যুর নির্জনে।

কিন্তু হ'লনা যাওয়া। অন্ধকার ভাটার চড়ায়
দুর্গের প্রাচীর হ'য়ে আটকে দিল দৃষ্টির গলুই।
অথচ প্রভাত হ'লে সে নদীটা সূর্য নামধারী
জনৈকের উষ্ণতায় হ'য়ে ওঠে ভীষণ গর্জনে
ধমনীর অন্তরালে রক্ত স্রোত ক্ষিপ্ত অজগর।
অথচ শব্দকে আমি ভয় করি, ঢের ভালো নির্জনের চোখ।

দেখো, তাই ভোর হ'লে আমি ঠিক পথ চিনে চিনে
খুঁজে নেবো সেই বাড়ী, নীল জানলা, সেই দীপ্ত মুখ······
জেলের জালের মত নির্জনতা সেইখানে পারিপার্শ্বিকতায়
চিরদিন পরিবৃত। উৎসব মঞ্চের ত্রিসীমায়
মেরুর মহান এক মৌনতায় ভীষণ সংকোচে,
শব্দেরা প্রবেশে বড়ো পরাঙ্মুখ সমস্ত শব্দেরা······

বাঁশি

কখনো কখনো দিনগুলি জ্বলে ওঠে।
নির্জনতায় নিজের মুখের ছবি
প্রেয়সীর মত অম্লান হয়ে ফোটে।

নির্জনতায় দৃশ্যবিহীন ফুলে,
প্লাবিত গন্ধ কা'কে যেন মনে পড়ে।
দুই হাত দিয়ে নির্জনতাকে ছুঁলে
ঘরবাড়ী ভাঙে খরতোয়া কোন ঝড়ে।

নির্জনতা কি বিকেলের অধিবাসী।
ছায়ার কণ্ঠে ম্লান পূরবীর স্বরে
নির্জনতা কি থাকে অন্তঃপুরে।

মায়ের মতন ঘনিষ্ঠ অবসরে,
যখন শব্দে নদী মাঠ গান করে,
দিনরাত ধরে কেন, কার বাজে বাঁশি।

অনিদ্রা

নিভন্ত ঘুম দুপায়ে মাড়িয়ে যাবে।
ঘরের ছায়াকে করে নেবে প্রিয় সাথী।
সাড়া দেবেনাকো কারো কোন প্রস্তাবে।

অনিদ্র এক তৃষ্ণায় কাঁপে কুঁজোর জলের বিক্তৃতা।

শোনা যাবে শুধু ক্লান্ত পদধ্বনি,
সপ্ত সাগরে লক্ষ ঢেউ-এর স্বর।
এই ঘরে শুধু রইবে অতঃপব—

নিজের নাম আর জ্বলা সিগারেব ধোঁয়া।

গেলাসের শেষতম বিন্দুব জলে, নেই শান্তিব আতত সম্মো‌ী।